শ্রীচৈতন্যদেব এবং পঞ্চম দোল ও পঞ্চম পুরুষার্থ

সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়

দোলযাত্রা। যাত্রা শব্দের অর্থ যাওয়া বা গমন। যে দেবতা গমন করেন তাকে মানুষ অনুসরণ বা অনুগমন করেন। সবচেয়ে বড় যাত্রা হল রথযাত্রা। স্বয়ং ভগবান রত্নসিংহাসন থেকে পথে নেমে রথে গমন করেন, আর লক্ষাধিক মানুষ ভগবানকে ঘিরে, ভগবানকে উদ্দেশ্য করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও অনুগমন করেন।

আর গমন করেন মহামায়ার পালনী শক্তি শ্রীবিষ্ণু। বছরে তিনটি পূর্ণিমায় তিন যাত্রা হয়ে থাকে। এক, দোল পূর্ণিমায় দোলযাত্রা। দ্বিতীয়, ঝুলন পূর্ণিমায় হিন্দোল যাত্রা। তৃতীয়, রাস পূর্ণিমায় রাসযাত্রা। দোল থেকে দোলন। দোলন যখন কম হয় তখন তাকে বলি স্পন্দন। তিন যাত্রায় তিন রকমের গতি আছে। প্রথম, দোলযাত্রায় স্পন্দন—দোলন। দ্বিতীয়, ঝুলনযাত্রায় হিন্দোল, আর তৃতীয়, রাসযাত্রায় নর্তন। দোলযাত্রা হয় বসন্তে। বসন্তে প্রকৃতির মধ্যে নতুন প্রাণের স্পন্দন আসে শীতের পর। অনুরাগের আবিরে দেবতাকে স্পর্শ করে স্পন্দন হয় তাই দোলযাত্রা। শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণের গায়ে ফাগ স্পর্শ করে দোল সম্পন্ন হয়।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 'পূজা পার্বণ' গ্রন্থে দোলযাত্রা প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করে বলেছেন—"ঋকবেদে ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভে নতুন বৎসর আরম্ভ করিতেন। তোমাদের দোলযাত্রা তাহারি স্মৃতি। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল হয় সাত সহস্র বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি। ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, চৈত্রী পূর্ণিমায় দোল দেখিয়াছি।" তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন ফাল্গুনী পূর্ণিমা দক্ষিণায়ণ--কালে হত না, উত্তরায়ণ আরম্ভ কালে হত। সেইজন্য এক সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হত, কারণ সেদিন বিষ্ণুর দোল। দোল উৎসব আদি। পরে এর সঙ্গে বসন্ত প্রবেশ করে বসন্তোৎসব ও পরে মদনোৎসব যুক্ত হয়েছে।

> চৈত্রে সিতৈকাদশ্যাঞ্চ দক্ষিণাভিমুখং প্রভুম
>
> দোলয়া দোলনং কুর্য্যাদগীতনৃত্যাদিনোৎসবম্।। (শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলাস, ১৪শ বিলাস)

অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে গীত নৃত্যাদি উৎসব সহকারে দেবদেবকে দক্ষিণমুখে করে দোলা দ্বারা দোলন করতে হয়— হরিভক্তিবিলাস বলেছেন।

ক্ষিতিমোহন সেন 'দোল উৎসব' প্রবন্ধের (আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫৩) শুরুতেই আক্ষেপ করেছেন "কোন বৈদিক যুগে ঋষি—মহর্ষিগণ এই বসন্ত --উৎসব করিয়া আজ কোথায় গেলেন। তারপর ভারত দীর্ঘদিন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া রহিল। কোথাও আর নব প্রাণের কোন সাড়া নেই। এমন সময় সারা ভারতের মধ্যে একটা নব প্রাণের সূচনা, নবযুগের অরুণোদয় হইল এই বাংলাদেশে। বাংলাদেশ মানব সমাজের মধ্যে নব বসন্ত দেখিতে চাহিল। ভগবানের শক্তি-বিভূতি বিরাজমান সর্ব চরাচরে।

মানুষের মধ্যেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা।" তাই নব বসন্তে পূর্ণ শশধর গৌরচন্দ্র উদিত হলেন। শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের আদি খন্ডে ১৩তম পরিচ্ছেদে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন—

'চৌদ্দশত সাত শকে মাস সে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাষী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।।
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ।।
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন।।
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন।।
জগৎ ভরিয়া লোক বলে 'হরি হরি'।
সেই ক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি'।। (৭০, ৭১)

দোল পূর্ণিমার পাঁচ দিন পর কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে আয়োজিত হয় রাধাকৃষ্ণের বিশেষ রং খেলার উৎসব। একেই বলে পঞ্চম দোল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে মহাপ্রভুর সম্মানে বিভিন্ন স্থানে আবারও রঙের খেলায় মেতে ওঠেন মানুষ। তারা মনে করেন রাধাকৃষ্ণের দোলের দিন মহাপ্রভুর দোল পালন করা উচিত নয়। তাই মহাপ্রভুর জন্য পঞ্চম দোল। দোল পূর্ণিমার দিন মহাপ্রভুর জন্ম, পরের দিন মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন পালিত হয়। তারপরের দিন হয় পাদুকা নিয়ে শোভাযাত্রা। কোথাও একে 'ধুলোট' উৎসব হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি দোলের আনন্দের এক বর্ধিত রূপ। খোল করতাল সহযোগে মন্দির পরিক্রমা করে, পথে পথে হরিনাম সংকীর্তন করে আবিরের রঙে পঞ্চম দোল জমজমাট।

পঞ্চম দোলের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই পঞ্চম কথার মধ্যেও একটি তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে ছাপিয়ে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমকে স্বীকৃতি দান করেছেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব; কারণ এই প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আস্বাদন করায়। পঞ্চম রস, মধুর রসেই পাঁচটি গুণ প্রকাশ পায় পূর্ণরূপে। এই মতেই পঞ্চম দোল পালন বৈষ্ণবদের অন্যতম রীতি।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার
শান্ত রতি দাস্য রতি সখ্য রতি আর।।
বাৎসল রতি মধুর রতি এ পঞ্চবিভেদ
রতি ভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চভেদ।।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।।"

আরেকটি লোক কথা অনুযায়ী, ললিতা, বিশাখা, শ্রীচিত্রা, চম্পকলতা, শ্রীরঙ্গ, ইন্দুরেখা বা তুঙ্গবিদ্যার মতো অনেক সখীরা কোন কারণে কৃষ্ণের সঙ্গে দোল খেলতে পারেনি। তাই ভক্ত বৎসল কৃষ্ণ তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য দ্বিতীয়া থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত বিভিন্ন তিথিতে পৃথক ভাবে দোল খেলেছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের পদাবলীতে আছে—

"খেলত ফাগু বৃন্দাবন চন্দ
ঋতুপতি মনমথ মনোরথ ছন্দ।।
সুন্দরীগণ করমন্ডলী মাঝ
রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী সাজ।।
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে।" (বসন্ত ঃ পদসংখ্যা ২১৮)

বাংলার নানা স্থানে অত্যন্ত ধূমধামের সঙ্গে ভক্তি সহকারে পঞ্চম দোল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নদীয়ার শান্তিপুর, আসানসোলের কুলটির মিঠানি, বাঁকুড়ার পুরন্দরপুর, বীরভূমের বড়া গ্রাম, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর, ডোমজুড়ের মাকড়দহ, কান্দি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর কিংবা পানিহাটির পঞ্চম দোল বিখ্যাত।

আসানসোলের কুলটির মিঠানি গ্রামের চট্টরাজ পরিবারের পঞ্চম দোল কেন্দ্রীভূত আছে দুটি শালগ্রাম শিলা —লক্ষীনারায়ণ জিউ এবং দামোদরচন্দ্র জিউকে ঘিরে। সমগ্র গ্রাম জুড়ে চলে পঞ্চম দোলের রেশ। বাঁকুড়ার পুরন্দরপুরেও চট্টরাজ পরিবারের পঞ্চম দোল খুবই বিখ্যাত।

পানিহাটির চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পঞ্চম দোলও খুবই ঐতিহ্যমন্ডিত। তাদের ঐতিহ্যবাহী দোলমঞ্চে পঞ্চম দোলের দিন আসেন শ্রী শ্রী রাধামাধব, মদনমোহন, নিতাই গৌর। দেবমূর্তিকে পালকিতে চেপে ঘোরানো হয় কারণ পৌরাণিক ইতিহাস বলে, পঞ্চম দোলের সময় শ্রীকৃষ্ণ সখা সখীদের সঙ্গে দোলায় চেপে আনন্দ করতেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের পঞ্চম দোলও খুবই প্রসিদ্ধ। রামকানাইকে নিয়ে এই দোল উৎসব পালিত হয়। রামকানাইয়ের বিগ্রহ নিয়ে গভীর রাত্রে শোভাযাত্রা বের হয়। এখানকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য পঞ্চম দোলে লাল আবির দিয়ে রং খেলা। কোচবিহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনমোহনকে ঘিরে দোল পূর্ণিমা থেকে পঞ্চম দোল পর্যন্ত উৎসব হয়ে থাকে। কাটোয়ার তাঁতীপাড়ার চট্টরাজ বাড়ির পঞ্চম দোলও খুবই প্রসিদ্ধ। চট্টরাজ বাড়ীর রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বয়স প্রায় ৩০০ বছর। নাটমন্দির থেকে দেবদর্শন করতে হয়, মূল মন্দিরে ওঠার অনুমতি নেই সাধারণ মানুষের।

কাটোয়ার পঞ্চম দোলের সঙ্গে বর্গী হানার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দী খাঁ উড়িষ্যা অভিযানে ব্যস্ত। তখন মারাঠা দস্যু ভাস্কর পন্ডিত বাংলা আক্রমণ করেন। বর্ধমানের পর কাটোয়া লুঠ করেন তিনি। তখন কাটোয়ার শ্রীখন্ড থেকে গৃহদেবতা মহাপ্রভুকে বাঁচাতে বীরভূমের নানুর থানার বড়া গ্রামে আশ্রয় নেন। সেই থেকে বড়া গ্রামের পঞ্চম দোল শুরু।

জয়নগর-মজিলপুরের রাধাবল্লভজীউ বিগ্রহ ঘিরে প্রতিপদ থেকে পঞ্চমী পর্যন্ত পাঁচ দিন দোল উৎসব হয়। মন্দিরের সামনে সুদৃশ্য নাটমন্দির ও মাঠে সুবিশাল দোলমঞ্চ। আজও দোলের সময় মন্দির সংলগ্ন কদম গাছে দুটি বা একটি কদম ফুল ফুটবেই। বর্ষাকালের ফুল কদম অলৌকিক ঘটনায় বসন্তকালে ফোটে রাধাবল্লভজীউয়ের চরণে স্থান পাওয়ার জন্য। ৩০০ বছরে পুরোনো মন্দিরে এই ঘটনার আজও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।। পঞ্চম দোল উপলক্ষে এই কদম ফুল ফোটা আজও ব্যাখ্যাতীত। মনে করা হয় এই বিগ্রহ যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য বা তার কাকা বসন্ত রায়ের গৃহদেবতা। তাদের মৃত্যুর পর সাবর্ণ রায়চৌধুরীর নায়েব মিত্র জমিদার এই বিগ্রহ পান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর মজিলপুরের পঞ্চম দোল আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

আবার হাওড়া ডোমজুড় ব্লকের মাকড়দহ গ্রামে পঞ্চম দোল অনুষ্ঠিত হয় দেবী মাকড়চণ্ডীকে আবির দিয়ে। ২০০ বছরের প্রাচীন এই ঐতিহ্য। এই দেবীকে ঘিরেই মাকড়দহের সমাজ জীবন আবর্তিত হয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদের হিলোড়া গ্রামের ৩০০ বছরের প্রাচীন শ্যামচাঁদ বিগ্রহকে ঘিরে পঞ্চম দোলের আয়োজন হয়ে আসছে। মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১১৬৮ বঙ্গাব্দে। তখন থেকেই চলছে এই পঞ্চম দোল। জনশ্রুতি এই, সুতির বাজিতপুর গ্রামে বলরাম, সর্বেশ্বর, মদনমোহন ও শ্যামচাঁদের মন্দির তৈরি হয়। তিন

ভাইয়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় শ্যামচাঁদ মন্দির ত্যাগ করেন। রামজীবন মহান্ত দাস সুতির হিলোড়া গ্রামে শ্যামচাঁদকে নিয়ে আসেন এবং দোল উৎসব শুরু হয়।

'গুপ্ত বৃন্দাবন' নবদ্বীপের দোল পুরোপুরি মহাপ্রভুকেন্দ্রিক। পঞ্চম দোলের সময় শ্রীকৃষ্ণ সখাসখীদের সঙ্গে দোলায় চেপে আনন্দ করতেন তাই নবদ্বীপে অনেক জায়গায় দোলা বা পালকিতে চড়িয়ে দেবমূর্তিকে ঘোরানো হয়। মনে করা হয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফাগের রঙে রাঙিয়েছিলেন অনিতা ও কাঞ্চনা। প্রচলিত গানে আছে—

'কীর্তন ফাগু খেলত গোরা বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে
মারে পিচকারি দোঁহা ছোঁড়া অঙ্গে।।'

রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু চৈতন্যদেব তাই নবদ্বীপের দোলের প্রাণপুরুষ। মঠে, আশ্রমে, আখড়ায়, পথে, প্রান্তরে চলে নাম সংকীর্তন। শহর পরিক্রমায় চৈতন্যদেব সন্ন্যাস পূর্ব সময়ে যেসব স্থানে লীলা করেছেন সেখানে সংকীর্তন হয়। মহাপ্রভুর জন্মের স্থান পঞ্চামৃত দিয়ে সাজিয়ে চৈতন্যদেবের প্রতীক হিসেবে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরের 'রাজরাজেশ্বর' শিলাকে ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করানো হয়। তারপর হয় অভিষেক। শিশু গৌরাঙ্গকে পড়ানো হয় লাল চেলি। মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশনের জন্য তৈরি হয় নানা পদ।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বাসুদেব ঘোষ শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী একজন কবি। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদ এবং মহাপ্রভুর লীলা নিজে দেখেছিলেন। গৌরাঙ্গের জন্মলীলা তিনি বর্ণনা করেছেন—

'জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে
জনম লভিল গোরা শচীর উদরে।।
ফালগুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফালগুনী
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি।।'
(দ্রষ্টব্য ঃ প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ঃ শ্রী সতী ঘোষ)

বাসুদেব ঘোষের বাল্যলীলা বর্ণনায় আমরা গৌরাঙ্গের দোল খেলার বর্ণনা পাই—

'দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়।
সহচর সঙ্গে বিহরে গোরারায়।
বিবিধ কুসুম সবে রচই হিল্লোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর।।
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেম তরঙ্গ।।'

সুতরাং দোল পূর্ণিমায় শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মই হয়নি, দোল খেলার সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরবর্তীকালে তাঁরই প্রেমতত্ত্ব বা ভক্তিতত্ত্ব ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে এক নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন করে। চৈতন্যদেবই দেখালেন প্রেমভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রাণ। শ্রীরূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে যাকে বলেছেন 'সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা'।

এই প্রেমতত্ত্ব বিষয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের সময় গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্য সাধন তত্ত্বের আলোচনা কিয়দংশ বলা যেতে পারে। এ এক অসাধারণ তত্ত্বকথা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের অমর মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। তারই পীযূষ একটু আস্বাদন করা যেতে পারে।

আমরা আগেই দেখেছি চারটি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চারটি কাম্য বস্তুই হল সাধ্য। যে জিনিসটি পাওয়ার

জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা হয় তাকে বলে সাধ্য—অর্থাৎ যা পেতে চাই তাই সাধ্য। এই কাম্য বস্তুকে চারটে ভাগ করি এবং তাদেরকেই পুরুষার্থ বলে। অর্থাৎ পুরুষার্থ হলো পুরুষ বা জীবের অর্থ বা কাম্য বস্তু। চারটি পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম অর্থ কাম তিনটির বাস্তবিক পুরুষার্থ নেই কারণ তিনটির কোনটি থেকেও অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায় না কিংবা পরিপূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। এর মধ্যে মোক্ষে পুরুষার্থতা আছে কারণ মোক্ষে চরম দুঃখ নিবৃত্তি হয় এবং অবিমিশ্র আনন্দের অনুভূতি হয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে মোক্ষ পুরুষার্থ হলেও পরম পুরুষার্থ নয়; কারণ মোক্ষপ্রাপ্ত জীবগণেরও ভগবৎ ভজনের জন্য লোভের কথা স্মৃতি-শ্রুতিতে দেখা যায়। তাই ভগবৎ ভজনের একমাত্র উপায় হল প্রেম। মুক্ত পুরুষও প্রেমের জন্য কামনা করে। যারা অন্য কিছুর প্রতি লোভ না করে ভগবৎ— সুখের উদ্দেশ্যেই প্রেমের সঙ্গে ভগবৎ—সেবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাদের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম হল একমাত্র সাধ্য বস্তু। প্রেমই সেবা সাধনাকে কৃষ্ণসেবা-সাধনার দিকে নিয়ে যেতে পারে। সেবার বৈশিষ্ট্য হলো সেব্যের আনন্দ দান। এই সেবার মধ্যে নিজের সুখ-বাসনার কোন স্থান নেই। কৃষ্ণপ্রেমই হলো বাস্তব্য সাধ্যবস্তু। প্রেম হল পরমপুরুষার্থ বা পরম সাধ্যবস্তু।

মহাপ্রভু রায় রামানন্দের কাছে এই সাধ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন—'প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়'। (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ ৫৪) রায় রামানন্দ নানারকম সাধ্যের কথা বলেছেন। প্রথমে তিনি প্রথম পুরুষার্থ ধর্মের কথা আলোচনা করেছেন এবং ক্রমশ মোক্ষের কথা বলেছেন। মোক্ষ পর্যন্ত মহাপ্রভু যতই শুনেছেন, তত "এহো বাহ্য" বলেছেন অর্থাৎ এটা বাহ্যিক বা বাইরের কথা। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রেমের গভীরতা অনেক বড়। রায় রামানন্দ যখন পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের কথা আরম্ভ করেছেন তখন প্রভু বলেছেন "এহো হয়", অর্থাৎ যখন দেখেছেন কৃষ্ণসেবা-বাসনার কথা রায় রামানন্দ আরম্ভ করেছেন তখনই বলেছেন "এহো হয়"। আবার যখন মহাপ্রভু দেখেছেন সেবা-বাসনা একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম করে গেছে তখন তিনি বলেছেন, "এহোত্তম"। এটাই সর্বোত্তম—'কৃষ্ণেন্দ্রিয়—প্রীতি—ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'। (চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, জীবের সাধ্য বস্তু কি শাস্ত্র মতে প্রমাণ কর। 'রায় কহে' স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়'। (৫৪) স্বধর্মাচরণ হল বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি বর্ণের জন্য শাস্ত্রে যে কর্তব্য কর্ম আছে এবং ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারটি আশ্রমের জন্য যে কর্তব্য কর্ম আছে তাকেই যথাক্রমে বর্ণধর্ম ও আশ্রম ধর্ম বা একত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম বলে। স্বধর্মাচরণ হল "শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মাচারপালন, কৃষ্ণে কর্মাপণ অর্থাৎ গীতায় যাকে ফলানুসন্ধান শূন্য কর্মানুষ্ঠান বলা হয়েছে।" (গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাদর্শের বিশিষ্টতা)

কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলছে বর্ণাশ্রম ভক্তি নয়, এতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি যে শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হবে তা নয়। কারণ এতে কৃষ্ণ প্রীতির অনুকূল সেবা পাওয়া যায় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করলে এই জীবনে সুখ- সম্পদ কিংবা পরকালে স্বর্গসুখ পাওয়া যেতে পারে--কিন্তু এসবই নিজের সুখ, নিজের চিন্তা, যাকে বলা যায় কাম বা কামনা কিন্তু এতে কৃষ্ণসেবা নেই বা দিতে পারে না।

শ্রীরূপ গোস্বামী "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"-তে উত্তমা-সাধন ভক্তির লক্ষণ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।। (১ম লহরী শ্লোক ১১)

অর্থ—জাগতিক কোন লাভ বা জ্ঞান-কর্মের আবিলতা ছাড়া কেবল কৃষ্ণকে সুখী করার অনুকূল প্রচেষ্টাই হল শুদ্ধভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ সেবার অনুকূল ও শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি বা শ্রদ্ধা ভক্তি লাভের সাধন। শ্লোকে উল্লেখিত অন্যাভিলাষ হল কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তির অভিলাষ ছাড়া অন্য বস্তু বা ব্যক্তির অভিলাষ। যে কর্মজ্ঞান ভক্তিকে আবৃত করে রাখে সেই কর্ম ত্যাগ করতে হবে।

সেই কর্ম কি? বর্ণাশ্রম আচার, যোগ, সকাম কর্ম, নিষ্কাম কর্ম। এই কথাই চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

‘অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞানকর্ম

আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।

এই শুদ্ধভক্তি—ইহা হইতে প্রেম হয়

পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।।’ (দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ঃ শ্রীরূপ গোস্বামী, ১ম লহরী)।

নারদভক্তিসূত্রেও তাই বলা হয়েছে, প্রেমই ভক্তি—সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা (সূত্র ২)

অর্থাৎ ভক্তি পরমাত্মায় পরমপ্রেমস্বরূপ। “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” মহাগ্রন্থের চতুর্থ লহরীর প্রথম শ্লোকে প্রেম ভক্তির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে—

‘সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ

ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে’

যে ভাবভক্তি চিত্তের অতিশয় আর্দ্রতা বা স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে, পরমানন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তি করায় এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা প্রদান করে---সেই ভাবকেই পন্ডিতগণ প্রেম বলে কীর্তন করেন। শ্লোকে বলা হয়েছে “ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা” অর্থাৎ ভাব যেখানে সান্দ্র বা অত্যন্ত গাঢ় তখন ‘বুধৈ’ অর্থাৎ বুধগণ বা পন্ডিতগণ তাকে প্রেম বলেন, বা সেটাই প্রেমের স্বরূপ। চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন-“সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।”

নারদপঞ্চরাত্রে এই প্রেম ভক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—ভগবানের (শ্রীবিষ্ণু) প্রতি অন্য বিষয়- মমতাবর্জিত প্রেমপরিপ্লুত যে--মমতা তাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ উদ্ধব, নারদ ভক্তি বলেছেন।

‘অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। মহাপ্রভু দশদিন ধরে রূপ গোস্বামীকে ভক্তি ভাণ্ডারের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন। এর মূল বিষয়টিকে একটু দেখা যাক। ভক্তিলতাবীজ তত্ত্ব ঃ মহাপ্রভু, ভক্তিকে একটি লতার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে ঘুরতে কোন এক ভাগ্যবান জীব ‘গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ।’ মালী যেমন বীজ বপন করে জল দেয়, তেমনি ভক্তকে শ্রবণ ও কীর্তনের জল দিয়ে এই বীজকে সিক্ত করতে হয়।—‘শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন।’ জল পেয়ে ঐ লতা বাড়তে বাড়তে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে বৈকুণ্ঠ এবং গোলক বৃন্দাবনে গিয়ে ‘কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ’। মহাপ্রভু এরপর সতর্ক করে বলেন, যদি লতা বর্ধিত হওয়ার সময় ‘বৈষ্ণব-অপরাধ’ ঘটে, তবে তা মত্ত হস্তীর মতো লতাটিকে উপড়ে বা ছিঁড়ে ফেলতে পারে। একে তিনি ‘হস্তী-অপরাধ’ বলেছেন। এই ভক্তিলতা বৃদ্ধি পাবার সময় কিছু আগাছা বা উপশাখাও জন্মাতে পারে। যেমন, ভুক্তি, মুক্তি, বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, লাভ, প্রতিষ্ঠা। মহাপ্রভু বলেন—এই উপশাখাগুলো যেন মূল লতার রস শোষণ করতে না পারে, তাই—

“প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন;

তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।।”

এভাবে ভক্তিলতাকে পুষ্ট করলে প্রেমফল পেকে মালী—ভক্ত আস্বাদন করতে পারে এবং ভক্তিলতাকে অবলম্বন করে মালী কল্পবৃক্ষ পায়। কবিরাজ ঠাকুর বলেছেন—

এইত পরম কল্পপরম পুরুষার্থ
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ।।

ফিরে যাই রামানন্দের প্রসঙ্গে। আমরা যদি রায় রামানন্দের মহাপ্রভুকে বলা সেই উক্তিটি বিচার করি যে "সধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়", দেখবো মহাপ্রভু এর উত্তরে বললেন—'প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর' (৫৫নং শ্লোক, শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত) অর্থাৎ তুমি যা বললে তো পরিপূর্ণ বাইরের কথা। এরপরে আরো যদি কিছু থাকে তাহলে বলো। এরপর রায় রামানন্দ বললেন— 'রায় কহে —'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার।'। শ্রীকৃষ্ণের চরণে সব কর্মফল সমর্পণই সাধ্যসার বা সাধ্যবস্তু সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে কর্ম অর্পণ যিনি করেন তার নিজের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই উদ্দেশ্য। যেখানে নিজের জন্য ভাবনা আছে যেখানে সত্যিকারের প্রেমভক্তি থাকতে পারে না। তাই মহাপ্রভু আবারও বললেন, 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।' এইভাবে মহাপ্রভু আর রায় রামানন্দের মধুর আলাপ এগিয়ে চলেছে। আর তৈরি হয়েছে পঞ্চম পুরুষার্থের এক অপূর্ব অনুপম তত্ত্ব। আমরা বিশেষ ব্যাখায় না গিয়ে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের সেই মধুর পদলীলা একটু পাঠ করি। (শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

'প্রভু কহে— এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে— স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার।। (৫৬)
প্রভু কহে— এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে— জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।। (৫৭)
প্রভু কহে— এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে— জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।। (৫৮)
প্রভু কহে— এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে— প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার।। (৫৯)
প্রভু কহে— এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে— দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।। (৬০)
প্রভু কহে— এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে— সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।। (৬১)
প্রভু কহে— এহোত্তম, আগে কহ আর
রায় কহে— বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।। (৬২)
প্রভু কহে— এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে— কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।। (৬৩)

রায় রামানন্দ যতগুলি সাধ্যসার হয় সবগুলি উল্লেখ করলেন। তৃতীয় স্তরে, স্বধর্মত্যাগ অর্থাৎ ধর্ম-অধর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণের প্রতি অচঞ্চল ভক্তিতে একমাত্র তাঁর শরণাগত হবার কথা বলে হয়েছে। স্মর্তব্য, গীতার বিখ্যাত প্রবচন 'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং

শরণং ব্রজ'। এরপর চতুর্থস্তরে ভাগবতে যে ভক্তিহীন জ্ঞানকে নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত করতে, সেই জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকে জীবের সাধ্যসার বলে রামানন্দ নির্দেশ করলেন।

চৈতন্যদেব এই চারটি স্তরকে (স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি) 'এহো বাহ্য' বলে অসারতা দেখিয়েছেন। ".......কেন না এগুলির সবকটিই ভক্তির উন্মেষহীন বাহ্য সাধনা। এ চারটিই হল শান্ত ভক্তের সাধনা যার শেষ সীমায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পর্যায়ে গৌণভাবে ভক্তির উদয় হলেও জ্ঞানের প্রবলতায় তার কোনো বিকাশ ঘটে না।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের বিশিষ্টতা) এরপর রায় রামানন্দ যখন বলছেন জ্ঞানশূন্যাভক্তি (জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্রবহীন ভক্তি), প্রেমভক্তি (কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনা), দাস্যপ্রেম (আমি ভগবানের সেবক দাস) তখন পর্যন্ত মহাপ্রভু বলেছেন "এহো হয়" অর্থাৎ এটা হতে পারে। গৌড়ীয় সাধনায় দাস্যভাবের সাধনা থেকে শুরু হয় রাগানুগাপ্রেমসাধনার। ভক্তির সূচনা এখান থেকেই। শান্তভাব (যেখানে ভগবানের ঐশ্বর্য জ্ঞান প্রধান) অপেক্ষা দাস্যভাবের (যেখানে সেবার মনোভাব প্রধান) সাধনা উচ্চমার্গের এবং ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ শান্তভাবের চেয়ে এখানে অধিকতর। আগে যেটা ছিল এহো বাহ্য, এখন হল তাই এহো হয়—তুমি কাছাকাছি এসেছ রামানন্দ আগের থেকে। আরেকটু এগিয়ে চলো। এত বড় তত্ত্বের মোড়ক কি এত সহজে ছাড়ানো যায়! এরপর রায় রামানন্দ যখন বলছেন, সখ্যপ্রেম (যারা কৃষ্ণকে নিজের তুল্য বা সখা বলে মনে করেন), বাৎসল্যপ্রেম (মাতা পিতা হয়ে যারা কৃষ্ণ প্রেমভক্তি করেছেন যেমন নন্দ, যশোদা) তখন মহাপ্রভু বললেন 'এহোত্তম' অর্থাৎ এটি উত্তম। তবে এর চেয়েও ভালো কিছু থাকলে রামানন্দ তুমি বলো। তখন রামানন্দ বললেন সেটি হল কান্তাপ্রেম। কেন ভালো? দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, রসের সাধকদের সঙ্গে ভগবানের একটা সম্পর্ক আছে; ভগবান কখনো প্রভু, বন্ধু, পুত্র। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা ব্যাখ্যায় বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ, সম্পর্কের বন্ধনে আটকে আছে। তাই সেবা ভক্তি যেন ঠিক বিকশিত হতে পারছে না। তাই কান্তাপ্রেম সর্বোত্তম। কান্তাপ্রেম বলতে কৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীদের ভালোবাসা বোঝায়। কান্তা বলতে ব্রজগোপীদের বোঝায়। কান্তাপ্রেমে নিজের অঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণের সুখের সেবা, তাই এটা সর্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এতে সন্তুষ্ট নন। তিনি প্রেম ভক্তির আরো গভীরে অবগাহন করতে চান। তাই তাঁর তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অসাধারণভাবে। রামানন্দকে মহাপ্রভু বললেন--

'প্রভু কহে-- এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।।' (৭৩)

এটা নিশ্চয়ই যে কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু। কিন্তু এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে তো বলো। পরম ভক্ত রায় রামানন্দ চরম ও পরম কথাটি বললেন—

'ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্য-শিরোমণি
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি।।' (৭৫)

অর্থাৎ এই কান্তাপ্রেম শ্রীরাধার মধ্যে সর্বাধিক বিকশিত হয়েছে। অন্য সব কিছু থেকে ব্রজগোপীদের প্রেম শ্রেষ্ঠ। আবার ব্রজগোপীদের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেম শ্রেষ্ঠতম। সব শাস্ত্রে সেই প্রেমের মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

দেবতাকে প্রিয় থেকে প্রিয়তম করে সাধনা করার ক্ষেত্রে কৃষ্ণভক্তি পঞ্চরসে বিভক্ত হয়েছে। শান্তভক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্য জ্ঞান প্রধান। কৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠাই ভক্তের একমাত্র আশ্রয়। "দেবতার ঐশ্বর্যভাবের প্রাধান্যহেতু এবং ভক্তের ভক্তির মধ্যে ভয় ও মুক্তিকামনা মিশ্রিত থাকায় শান্তভক্তির স্থান কৃষ্ণভক্তির পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের" (বৈষ্ণব পদসঙ্কলন, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। দাস্যভক্তিস্তরে শান্তভক্তির নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তের সেবার মনোভাব থাকে। সেব্য ও সেবকের সম্পর্ক। সখ্যরসে অতিরিক্ত যে গুণ থাকে তা হল সমপ্রাণতা। ব্রজবালকদের গোষ্ঠলীলায় এই সমতা যুক্ত হয়েছে। বাৎসল্য রসে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে কল্পনা করে সেবা করা হয়।

শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ও সখ্যের সমপ্রাণতার সঙ্গে অতিরিক্ত গুণ এখানে যুক্ত হয়েছে। সবশেষে মধুর রস। "শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম জ্ঞানে আত্মসমর্পিতপ্রাণা শ্রীরাধা ও ব্রজগোপীদের যে রাগাত্মিকা ভক্তি শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সমতা, বাৎসল্যের মমতা প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমর্থা রতির নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনের মাধুর্য গুণ।" (প্রাগুক্ত) এই সাধনাই হল বৈষ্ণবভক্ত সাধারণের সাধনা।

সুতরাং গৌড়ীয় সাধন মার্গে মধুর রসাত্মক প্রেমভক্তিই পুরুষার্থ--শিরোমণি--প্রেম মহাধন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের সব গুণ মধুর রসে বিদ্যমান। "শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে। (চৈ.চ. ২/৮/৬৭) সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় চার পুরুষার্থের উপরে পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থ হিসেবে এসেছে মধুর রসের সাধনা। মুক্তি নয়, কৃষ্ণ সেবানন্দই বৈষ্ণবের পরম পুরুষার্থ। ভাগবতেও তাই বলা হয়েছে—

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্মমপ্যুত।

দীয়মানং না গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।। (তৃতীয় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়, ১৩ নং শ্লোক)

মাতা দেবহূতিকে ভগবান কপিলদেব বলছেন—সালোক্য অর্থাৎ আমার সঙ্গে একলোকে বাস; সার্ষ্টি, আমার তুল্য ঐশ্বর্য প্রাপ্তি, সামীপ্য, আমার নিকটে থাকা; সারূপ্য, আমার সমান রূপ পাওয়া; এবং একত্ব, অর্থাৎ সাযুজ্য বা আমার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যুক্ত হওয়া; এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমার ভক্তদের দিতে চাইলেও তাঁরা আমার সেবা ব্যতীত কিছুই নিতে চান না।

ভাগবতের নবম স্কন্ধে শ্রীভগবান দুর্বাসাকে বলছেন—

মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণা কুতোহন্যৎকালবিদ্রুতম।। (নবম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক ৬৭)

অর্থাৎ, আমার সেবা করতে যাঁরা অত্যন্ত উৎসুক চিত্ত, তাঁরা সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি পেলেও তা নিতে ইচ্ছুক নয়। তাহলে যে সব পদার্থ কালের গতিতে বিনষ্ট হয় সেই সব প্রাকৃত পদার্থের কথা আর কী বলা যায়।

এ তত্ত্বের সূচনা করেন শ্রীচৈতন্যদেব সাধ্যসাধন তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে রামানন্দের কাছে। রাধাভাব সম্বলিত কৃষ্ণের স্বরূপ চৈতন্যদেবের মধ্যেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। রসরাজ কৃষ্ণ ও মহাভাবের আধার রাধা এক চৈতন্য--দেহে লীন হয়ে আছেন। রায় রামানন্দের কাছে চৈতন্যদেব সেই স্বরূপ প্রকাশ করেছেন—

'তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ—।

রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ'।। (মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৩)

রামানন্দ ছাড়া চৈতন্যদেবের এই রূপ আর কেউ দেখেনি এবং এই তত্ত্ব-লীলা রামানন্দের কাছে প্রকাশ করেছেন বলেই এই রূপ তিনি দর্শন করতে সমর্থ হলেন। কারণ, 'রামানন্দসহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র'—স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ সেটিও নিজেই প্রকাশ করে গেছেন রামানন্দের কাছে। এবং কি আশ্চর্য্যজনক, স্বয়ং ভগবানও গীতাতে পরম ভক্ত অর্জুনের কাছে তার স্বরূপ প্রকাশ করে গেছেন। একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন—

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।"

—হে পার্থ নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্যমূর্তি দর্শন কর। আবার আমরা দেখি এ যুগে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে "যাবার আগে হাটে হাড়ি ভেঙে" নিজের স্বরূপ গৃহী ভক্তদের (বিবেকানন্দ কাশীপুর উদ্যানবাটিতে থাকলেও ঐ স্থানে ছিলেন না) দেখিয়ে গেলেন। চৈতন্যদেব নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন রামানন্দের কাছে---

'গৌর-অঙ্গ নহে মোর— রাধাঙ্গ-স্পর্শন।

গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জন।। (২৩৮)

মহাপ্রভু বলছেন আমার অঙ্গ গৌর বর্ণ নয়। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা নিজের অঙ্গ দিয়ে আমাকে স্পর্শ করে আছেন বলেই আমি গৌরাঙ্গ। এই দিক থেকে তিনি রাধা। আবার শ্রীরাধা, 'গোপেন্দ্রসুত বিনা' অর্থাৎ ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কারো অঙ্গ স্পর্শ করেন না। এর অর্থ, শ্রীরাধা যখন চৈতন্যদেবের অঙ্গ স্পর্শ করেছেন তখন বুঝতে হবে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং গোপেন্দ্রসুত শ্রীকৃষ্ণ---সেইজন্যই তিনি ওই অঙ্গ স্পর্শ করেছেন। সুতরাং চৈতন্যদেবই রাধা চৈতন্যদেবই শ্রীকৃষ্ণ। মোক্ষের ঊর্ধ্বে উঠে প্রেমের এই চরম পুরুষার্থতার জয়গান গেয়েছিলেন যে চৈতন্যদেব তাঁকেই স্মরণ করে আজও চলে আসছে পঞ্চম দোল।

ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে (৮৯২ বঙ্গাব্দে ২৩ ফাল্গুন) মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শুধু জন্মই হয়নি, তাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে আবর্তিত হয়েছে দোলযাত্রা ও পঞ্চম দোলযাত্রা।। বৈষ্ণবদের কাছে এ অত্যন্ত পবিত্র তিথি। এই দিনটির আরেক নাম গৌরপূর্ণিমা। এই পঞ্চম দোলকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপসহ সারা বাংলায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই দোলের আরেক নাম হলো গৌরদোল। নবদ্বীপের দোল তাই যতটা না রাধাকৃষ্ণের তার চেয়ে বেশি মহাপ্রভুর দোল। বৈষ্ণবদের দোল চৈতন্যময়। দ্বাপরে কৃষ্ণের ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠ লীলা দোললীলা। ভারতের বসন্ত উৎসব বা হোলি। বাংলার প্রাণচৈতন্য শচীনন্দন মহাপ্রভুর গৌরদোল, হরিবোল ধ্বনিতে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বাংলাকে রাঙিয়ে দিয়েছিল। মানুষ জেনেছিল অন্তরের আর্তিকে শব্দের উচ্চারণে রূপান্তরিত করতে।

'ইদমন্ধংতমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়্ম।

যদি শব্দাহয়ং জ্যোতিরাসংসারং না দীপ্যতে।' (কাব্যাদর্শ ঃ দণ্ডী ১/৪)

—শব্দের জ্যোতি যদি সংসার জুড়ে না জ্বলত, তাহলে পৃথিবী ডুবে যেত অন্ধকারে। সেই অন্ধকার থেকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য রংয়ের মধ্যে প্রেমরস মিশিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। মনের চক্ষুতে বসন্তনাথ, বসন্তসখা বলতে চৈতন্যদেবের রূপই ভেসে আসে ঃ হেমকান্তি সমুজ্জ্বলদেহ, অশ্রুসিক্ত নয়ন, নগ্নপদ, গলায় রক্ত পলাশের মালা, পায়ে রক্ত আবির, দুই হাত আকাশে তুলে দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাধাভাবে ভাবিত হয়ে একা চলেছেন কৃষ্ণ অভিসারে। ৫৪০ বছর ধরে কীর্তনের দল গেয়ে যাচ্ছে সেই পরমপুরুষের বন্দনা গান—"জয় জয় শ্রীচৈতন্য দোল-দুলাল"।

তাই বসন্তকালের দোল পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হার মেনেছে এই চৈতন্যচন্দ্রের কাছে। কবি পরমানন্দ সেন বলেছেন-—

"পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে

পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা

'আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে

রতন হইল কত জনা।।'

শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীচৈতন্যদেবের স্পর্শে বাংলার সমাজজীবন পূত হয়েছে এবং 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' (আমরা ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। অমরেন্দ্রনাথ রায়। বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬।

২। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত।

৩। ক্ষিতিমোহন সেন। বঙ্গমানস ও অনান্য। সম্পাদনা ঃ প্রণতি মুখোপাধ্যায়।

৪। দিলীপকুমার দত্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের বিশিষ্টতা। মন্দ্রাক্রান্তা, ১৪২১।

৫। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বৈষ্ণব পদসঙ্কলন, বুকল্যাণ্ড, ১৩৬৬।

৬। মৃত্যুঞ্জয় দে সম্পাদিত ঃ গোবিন্দদাস পদাবলী, ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, ১৩৫১।

৭। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। পূজা-পার্বণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮।

৮। শ্রীরূপ গোস্বামী ঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘতঃ কলকাতা, ১৩৯৬।

৯। সতী ঘোষ ঃ প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৬১।